ফেলুদার হাতিয়ার

ফরেনসিকের সহজপাঠ

অনিন্দ্য ভুক্ত

লিইবার ফিয়েরা

প্রাক্‌কথন

গল্পের বই পড়তে ভালবাসে, অথচ রহস্য-কাহিনির দিকে ঝোঁক কম, এমন পাঠক নেই তা নয়, তবে নিশ্চিতভাবেই তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত। ঠিক তেমনই, রহস্য-কাহিনি পড়তে ভালবাসে, অথচ গোগ্রাসে গেলার অভ্যেস নেই, এমন পাঠককূলকেও দূরবিন ছাড়া দেখতে পাওয়া দুষ্কর। আসলে রহস্য-কাহিনির পাঠকেরা প্রায়শই গল্পের মধ্যে এমন বুঁদ হয়ে যান, জটমুক্তির যুক্তির বিন্যাসের দিকে তাদের নজর থাকে না, বরং যাবতীয় আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয় 'অপরাধী কে', এই প্রশ্নের চারপাশে। অথচ রহস্য-কাহিনির মূল রস কিন্তু ঐ যুক্তির বিন্যাসেই। তবে যুক্তির বিন্যাসে অপরাধী-শনাক্তকরণ সম্ভব হলেও সেই অপরাধীকে আদালতের চোখে চূড়ান্তভাবে দোষী সাব্যস্ত করতে হলে চাই তথ্যের প্রমাণ। আর সেই প্রমাণ যোগাড়ের একমাত্র হাতিয়ার ফরেনসিক বিজ্ঞান। যে বিজ্ঞানের শুরু হয়েছিল হাতের ছাপ দিয়ে, আজ সে বিজ্ঞান বহু পথ পেরিয়ে এসেছে, রহস্য-অনুসন্ধানকারীদের হাতে তুলে দিয়েছে অপরাধ প্রমাণের অজস্র হাতিয়ার। ফরেনসিক সায়েন্স কীভাবে অপরাধীকে তথ্য-প্রমাণ সহ শনাক্ত করে সে কাহিনিও কিন্তু তাই কম আকর্ষণীয় নয়। অথচ জটিল

বিজ্ঞানের অজুহাত দিয়ে এইসব কাহিনি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কোনও উদ্যোগই এতদিন নেওয়া হয়নি। এই বইয়ে তাই বিজ্ঞানের জটিলতাগুলিকে যথাসম্ভব পরিহার করে বিষয়গুলিকে পাঠকের কাছে হাজির করার চেষ্টা করা হয়েছে। মূলত কিশোর পাঠকের কথা মাথায় রাখলেও এই বই যে সবার কাছেই আকর্ষণীয় মনে হবে কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, সে ব্যাপারে কোনও সংশয় নেই।

২৩ এপ্রিল, ২০২২
আরামবাগ

সূচি

রহস্যের অন্দরমহল ১১
জুতোর ছাপ ২০
হাতের ছাপ ২৮
গুলির ছাপ ৪০
রক্তের দাগ ৪৭
মাথায় পাপের ছাপ ৫৫
ডিএনএ-র ছাপ ৬৭
মিথ্যে ধরার যন্ত্র ৭৬

রহস্যের অন্দরমহল

“ফেলুদা সবার অলক্ষ্যে নীচু হয়ে চট করে কী যেন একটা কুড়িয়ে নিল। তবে সবার নজর এড়ালেও সেটা আমার নজর এড়াতে পারল না।”

না, এটা কোনও ফেলুদা কাহিনির অংশ নয়। তোপসের মুখের বাক্যও এটা নয়। তবে হতে পারত। গোয়েন্দাদের এমন কাজ করতে হামেশাই দেখা যায়। তবে গল্পের গোয়েন্দাদের তো বাস্তবে দেখা পাওয়া খুব মুশকিল। বাস্তবে এই কাজটা করে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীরা।

কোনও রহস্য কিনারার প্রথম ধাপ অকুস্থল পরিদর্শন এবং নমুনা সংগ্রহ। অকুস্থল মানে অপরাধ যেখানে সংঘটিত হয়েছে। যেখানে খুন হয়েছে বা যে ঘরে তালা ভেঙে চুরি হয়েছে, অকুস্থল সেটিই। আসলে রহস্য অনুসন্ধানের প্রথম পাঠেই লেখা থাকে দুটি বেদবাক্য। একটি হল, অপরাধী

কোনও স্বাক্ষর না রেখে যায় না। অন্যটি হল, "যেখানে দেখিবে ছাই/ উড়াইয়া দেখো তাই/ পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন।"

এই কারণেই রহস্য অনুসন্ধানের প্রথম পর্বেই থাকে অকুস্থল পরিদর্শন এবং নমুনা সংগ্রহের কাজটি। যদি অপরাধী কোথাও না কোথাও তার অপরাধের ছাপ রেখে যায় তাহলে অকুস্থলটি তন্ন তন্ন করে দেখা, কোনও জিনিসকেই তুচ্ছ না ভেবে সবকিছুকেই প্রয়োজনে উল্টেপাল্টে পর্যন্ত দেখা, যেকোনও অনুসন্ধানকারীর প্রাথমিক কর্তব্য।

অকুস্থল পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ এবং তারপর ল্যাবরেটরিতে সেগুলির পরীক্ষানিরীক্ষা, এই পুরো কাজটিই একটি বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া। বিজ্ঞানের এই শাখাটির নাম ফরেনসিক সায়েন্স। যেকোনও রহস্য অনুসন্ধানের পিছনে এই অন্দরমহলের ভূমিকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাথমিক তদন্তকারীদের দলে অন্তত তিনজনের উপস্থিতি খুবই প্রয়োজনীয়। গোয়েন্দা স্বয়ং, একজন ফটোগ্রাফার এবং আরেকজন, যিনি যেকোনও রকম নমুনা সংগ্রহে প্রশিক্ষিত এবং অত্যন্ত দক্ষ। তবে বেশি ভাল হয় আরও দু'জন সঙ্গে থাকলে। একজন, যিনি পুরো অকুস্থলের একটা স্কেচ করে নিতে পারবেন খুঁটিনাটি মাপজোক-সহ। আরেকজন, যিনি সবকিছুর নোট করে নেবেন খাতায়-কলমে।

অকুস্থলে পৌঁছে প্রথম কাজটি ফটোগ্রাফারের। কেউ কোথাও হাত দেওয়ার আগে যেখানে যা আছে, যেমন আছে, তার খুঁটিনাটি ছবি তুলে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

তবে তত্ত্ব বলে, যতটা সম্ভব বিস্তারিতভাবেই নমুনা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এবং নমুনা সংগ্রহের কাজটি যেমন তেমন ভাবে করলে চলবে না, করতে হবে অত্যন্ত সযত্নে, সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে। সংগ্রহের পর আবার সেগুলিকে প্যাকেটজাত করতেও হবে নিয়ম মেনে। প্রতিটি নমুনাকে যেমন আলাদা আলাদা ভাবে প্যাকেটজাত করতে হবে, তেমনই বিভিন্ন ধরনের নমুনাকে কিছু সুনির্দিষ্ট প্যাকেটেই রাখা নিয়ম। যেমন চুলের কিছু নমুনা পাওয়া গেলে সেগুলিকে কাগজ বা প্লাস্টিকের প্যাকেট বা কাচের শিশিতে রাখা যেতে পারে। অন্যদিকে কোনও ভাঙা কাচের কুচি পেলে কোনও প্লাস্টিকের প্যাকেটে রাখা যাবে না, কেননা সেক্ষেত্রে সেই কুচিটিকে পরে আলাদা করা অসুবিধেজনক হতে পারে। আবার

জুতোর ছাপ

জুতোর ছাপ দিয়েও চিনে ফেলা যায় লোকটিকে, কাল রাত্রে যে গ্রিল ভেঙে চুরি করে নিয়ে গেছে বুবাইয়ের ট্যাবলেটটা।

এভাবে যে চেনা যায়, সে কথা অবশ্য সবারই জানা। সবার মানে, যাদের একটু গোয়েন্দা গল্প-টল্প পড়ার নেশা আছে। তবে কিনা জানা আর বোঝার মধ্যে একটা পার্থক্য তো আছেই। জুতোর ছাপ থেকে চোরকে চেনা যায় এ কথা জানা থাকলেও, কীভাবে যায়, সেটা কিন্তু খুব কম জনেই বোঝে। জানা আর বোঝার মধ্যেকার এই দেওয়ালটা ভেঙে ফেলার একটু চেষ্টা করা যাক।

যাঁরা অপরাধতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন, একটা কথা তারা

হলেও বাকিটা কিন্তু একজন পায়ের ছাপ বিশেষজ্ঞের। কাজ বলতে প্রথমে সেই ছাপ তুলে নিয়ে যাওয়া। নিয়ে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে বিশ্লেষণ করা।

ছাপ তুলে নিয়ে যাবার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। তবে প্রথম

দেন গোয়েন্দারা। সেই পাউডার আঙুলের ছাপের মাঝের শূন্যস্থানগুলিকে ভরাট করে দিলে বাকি ছাপটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আর অন্যদিকে যেগুলো স্পষ্ট ছাপ, যেগুলোকে ইংরেজিতে বলে পেটেন্ট প্রিন্ট, সেগুলোর ক্ষেত্রে এতসব ঝামেলার দরকারই পড়ে না, সরাসরি ফোটো তুলে নিলেই চলে। অপরাধী যেখানে রক্তমাখা হাতের ছাপ ফেলে চলে যায় সেখানে ছাপ সংগ্রহের এটাই পদ্ধতি।

তবে এ তো গেল অপরাধী যেখানে অসতর্ক হয়ে ছাপ ফেলে যায়, সেই ছাপ সংগ্রহের কথা। আর উইলিয়াম হার্শেল যে কাজের উদ্দেশ্যে আঙুলের ছাপ নিতে শুরু

প্রচ্ছন্ন হাতের ছাপকে কালির সাহায্যে দৃশ্যমান করে তোলা হচ্ছে

গুলির ছাপ

নিশানায় এতটুকু ভুলচুক হল না ফেলুদার। ভুল হল না মগনলাল মেঘরাজকে কড়ায়-গন্ডায় হিসেব বুঝিয়ে দিতে। নিজের ডেরায় পেয়ে জটায়ুকে নিয়ে ঠিক যেভাবে ছুরির খেলা দেখিয়েছিলেন মগনলাল, ঠিক সেভাবেই মছলিবাবাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ম্যাগাজিনের ছ'টা গুলি পরপর খালি করে দিল ফেলুদা।

তবে ফেলুদা তো গল্পের গোয়েন্দা। বাস্তবের গোয়েন্দারা কিন্তু কথায় কথায় এমন গুলি চালায় না। বরং তারা অপরাধীদের ছোড়া গুলি নিয়ে গবেষণা করে। পরীক্ষানিরীক্ষা করে বোঝার চেষ্টা করে, কোন বন্দুক থেকে ছোড়া হয়েছে গুলিটা। একে বলা হয় ব্যালিস্টিক ফিঙ্গারপ্রিন্টিং, বন্দুকের